সন্দেহ অথবা নিছক প্রাত্যহিকী

উঠে পড় বাপধন, আজকেও নটায় অফিস তোমার - ভোরবেলায় বিছানাতে উঠে বসে অ্যালার্মের আওয়াজ অনেকটা এইরকম ই লাগে। একটুখন বিছানায় লটকে থেকে উঠে পড়ল সুমন। টুথব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে বারান্দায় দাঁড়াতে প্রতিদিনের চেনা দৃশ্য - আধো আলো আকাশ, ঝলক দেওয়া ঠান্ডা হাওয়া আর পরতে পরতে খুলে যাওয়া, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসা একটা দিনের আবেশ। আজ অবশ্য দিনটা একটু অন্যরকম - কিছুটা আশা আর অনেকটা উৎকন্ঠায় মেখে আছে ব্যতিক্রমী সাজ। তানিয়ার কলেজ সার্ভিস কমিশনের রেজাল্ট আউট হবে আজ। মেয়েটা কাল রাতে ঘুমাতে পেরেছে কিনা সন্দেহ, যা টেনশন করে ! মুখ ধুয়ে এসে মোবাইলটা একবার হাতে নিয়েও রেখে দিল সুমন। থাক, হয়তো অনেক দেরিতে ঘুমিয়েছে বেচারী। অফিসে পৌঁছে করে নিলেই হবে।ট্র্যাকস্যুট, জুতো পরে, মা কে ডেকে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল অন্যান্য দিনের মত। তাদের এই বাড়িটার একটা সুবিধা আছে। খুব কাছেই একটা পার্ক। দু'চারজন বেশ চেনাজানাও হয়ে গেছে এই সুবাদে। সবাই যে একই বয়সী, বা খুব কাছাকাছিই থাকে তাও না। হয়তো তার চট করে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা আর ভোরবেলার মন ভালো করে দেওয়া আলো, মিহিন বাতাস হাত ধরাধরি করে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।

পার্ক থেকে ফিরে অন্যান্য দিনের মতই কম্পিউটারে বসে টুকটুক মেল করে নিল সুমন। কিছু ডেটা কাল রাতে প্রসেস করা ছিল, সেসব সিডিতে ভরে নিয়ে চটপট স্নান সেরে সোজা খাবার টেবিল। বেরোতে যাবার মুখে মোবাইল বেজে উঠল, বের করে দেখে তৃণা।

- 'হ্যাঁ, কি ব্যাপার, সতসকালে !"
- 'আরে গাড়িটা ট্রাবল দিচ্ছে।"
- 'আবার আজ !"
- 'তো কি করব ! শোন, তুমি একটু-------"
- আরে বাবা, ঠিক আছে। অভ্যেস হয়ে গেছে, আসছি।" হেসে মোবাইল অফ করে পকেটে রখে সুমন। তৃণার গাড়ি প্রায়শই গড়বড় করে। অথচ খুব একটা পুরনো নয়। বছর পাঁচেক আগে কেনা। ওর বাবার রিটায়ারমেন্টের কিছু আগে। তৃণার সাথে তার প্রথম আলাপ চকরীতে জয়েন করার ঠিক দিন পনেরোর মাথায়। দুজনেরই কাজ এক গোত্রের, একটা কেমিক্যাল কোম্পানীর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগে, সায়েন্টিস্ট পোস্টে। প্রথম কথাবার্তা স্বাভাবিক ভাবে কাজের ব্যাপারেই শুরু হয়। তারপর ধীরে ধীরে ক্যান্টিনে আড্ডা, পার্টি এসবের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আরো কাছাকাছি আসা - বন্ধুত্বের রং ঈষৎ গাঢ়।

দুজনেই প্রচণ্ড আড্ডাবাজ। পার্থ্যক্য এই যে, সুমন কাজের সময়ও হাসিখুশী আর তৃণা একদম উল্টো। তৃণার এই গাড়ির ব্যাপারে সুমন এতদিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। যদিও তৃণার বক্তব্য তার অভ্যেসটা বজায় রাখার জন্যই নাকি তার গাড়িটা নিজে থেকেই এরকম মাঝে মধ্যেই খারাপ হয়, ইত্যাদি এবং কথাগুলো বলার সময় বেশ সিরিয়াস মুখ করে থাকে। অবশ্য পরমূহুর্তেই দুজনে আবার বকবক শুরু হয়। এ যেন এক খেলা চলে - হাসি আর কথার অনুসঙ্গে - নিরবচ্ছিন্ন।

আজও তৃণাকে বাড়ি থেকে পিক আপ করে সুমন স্টার্ট দেয় গাড়িতে। ঘুরপথে আসতে হয় বেশ কিছুটা। এই সময়টা ট্র্যাফিক ও ব্যস্ত থাকে। অবশ্যম্ভাবী দেরীর কথা ভেবে সুমন কপট রাগ দেখায়, 'তোমার গাড়ি একটু আগে থাকতে ওয়ার্নিং দেয় না কেন ?" আরো কিছু বলার আগেই উত্তর ছিটকে আসে, "কেন ? সারারাত বাড়ির সামনে গাড়ি নিয়ে বসে থাকতে !" হো হো করে হেসে ওঠে সুমন, "তানিয়া বিয়ের আগেই মামলা ঠুকে দিত। ফলশ্রুতি - আমায় তোমাকেই প্রপোজ করতে হত আর তারপর তুমি আর তোমার গাড়ি ! ওফহো !" "ভাবা যায় ! তুমি শেষমেষ আমায় প্রপোজ করছো, সারারত গাড়িতে বসে থাকার পর ! হাউ রোম্যান্টিক !" হাসিতে ভেঙে পড়ে তৃণা। খুনসুটি চলতে চলতেই পৌঁছে যায় গাড়ি, মিনিট পনের লেট - ম্যানেজেবল অফকোর্স। গাড়ি পার্ক করে ঢুকে পড়ে দুজনে, নিজের নিজের ল্যাবে। নিজের রুমে এসে সুমন দেখে প্রলয় অপেক্ষা করছে। কালকের জমা দেওয়া স্যাম্পেলগুলোর রেজাল্ট নিয়ে। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে চটপট অ্যানালিসিস সেরে ফেলে সুমন। বাকি কাজটা প্রলয় সামলে নিতে পারবে। সুমন অতএব নির্বিঘ্নে মন দেয় গতকাল স্যারের দেওয়া প্রজেক্টের ফাইলটা নিয়ে। দুদিনের মধ্যে তার মতামত জানাতে হবে এ ব্যাপারে - অর্থাৎ এই কাজটা শুরু করা যায় কিনা। এমন নয় যে তার কথাই শেষ কথা। একই বিষয়ে আরো পাঁচজনকে কাজে লাগানো হয়েছে। সবার রিপোর্ট দেখে গ্রুপ মিটিং এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তারপর কাজ শুরু হবে। ঘন্টাখানেক একমনে পাতা উল্টে চলে সুমন। এরমধ্যে অবশ্য বার দুয়েক দুজন ঘুরে গেছে। তার গ্রুপের অন্য দুজন। হতে কলমে কাজগুলো ওরাই করে মূলত। প্রয়োজনে সুমনকেও যেতে হয় মাঝেমধ্যেই। এখন যেমন একবার উঠতে হল। ঘুরে এসে বসতে গিয়েও বারান্দায় বেরিয়ে এল সুমন। সিগারেট ধরালো একটা। ধোঁয়া উড়ছে - চিন্তা - প্রজেক্টটা দাঁড়াবে বলে মনে হচ্ছে না। টিফিনে তৃণার সাথে কথা বলতে হবে, ওর কাছেও তো কপি গেছে।

টিফিন পিরিয়ড। দোতলার ক্যান্টিনে বসে সুমন বলে তার দুশ্চিন্তার কথা। তৃণাও প্রায় একমত। তবে ওর ধারণা স্কীমটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলে ব্যাপারটা দাঁড়াতেও পারে। একেবারে হাল ছেড়ে দেওয়ার মত কিছু নেই। আপাতত ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়। কথার পিঠে কথা আসে। হাসি মজা চলতে চলতে মোবাইলে

ডাক। ফোন তোলে সুমন। তানিয়া। একমূহুর্ত থমকে যায় সুমন, কলেজ সার্ভিস কমিশনের রেজাল্ট, অফিসে পৌঁছে ফোন করার কথা - একটু সতর্ক গলায় বলে, " খবর কি ?"

- "হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি---------"

- শোন তানি, অফিসে পৌঁছেই করতাম। কিন্তু আসার সাথে সাথেই প্রলয়ের সাথে আগের দিনের রেজাল্টগুলো, নতুন প্রজেক্টের প্রপোজাল এইসব নিয়ে-----"

- "আমি বাড়িতে ফোন করেছিলাম। তুমি তখন বেড়িয়ে গেছ তোমার বান্ধবীকে লিফট দিতে"- ঈষৎ উত্তপ্ত শোনায় তানিয়ার গলা। সুমন বুঝতে পারে কোনদিকে গড়াতে পারে ব্যাপারটা। বিশেষত তৃণা সামনেই বসে। অবশ্য ওর কাছে অজানা নয়। আজকেও গাড়িতে আসার সময় একপ্রস্থ ইয়ার্কি হয়ে গেছে এই নিয়ে। তবু কথা কাটাকাটির এড়িয়ে যাওয়ার লক্ষে সুমন বলে ওঠে, "ওসব বাদ দাও তো। বিকেলে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো বল। আজ তো তোমার দিন"। একটু বুঝি নরম হয় তানিয়া, "তৃষার বাড়ি হয়ে যাব। আমরা নিউমার্কেটের সামনের কফিশপে থাকব, ঠিক ছটার মধ্যে চলে এসো।"

-"ঠিক আছে, পৌঁছে যাব"- সুমন একটু নিশ্চিন্ত হয়। "চিন্তা নেই, দেরী করব না। একটু আগে অফিস ছাড়তে হবে এই যা। ও প্রলয় সামলে নেবে।"

ফোন রেখে সুমন দেখে তৃণার মিটমিটে হাসি, "যুদ্ধক্ষেত্র আর বুঝি ক্রোশদুই বাকি"-এবার উচ্চকিত হাসি দুজনেরই।

- "যাক, এবার তাহলে বিয়ের কার্ড ছপিয়ে ফ্যালো"।

- "হ্যাঁ, সেই।" সুমন সিগারেট ধরায়। তানিয়ার জেদই ছিল চাকরিতে না ঢুকে বিয়ে করবে না। সুমন ও বেশী জোর করেনি। দুই বাড়ির অপেক্ষার দিন শেষ হল আজ। আর আজই প্রথমবার ভুল হল সুমনের, তানিয়াকে ফোন করতে।

- "বিকেলে তাহলে তুমিও একটু আগেই বেরিয়ে পড়", টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে বলে সুমন, "তোমাকে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে যাব ওখানে।"

- "উঁহু ! তাহলে কাল সকালে পাত্রীর নাম বদলাতে হবে কিন্তু !"- কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে উঠে পড়ে তৃণা। উফফ ! মেয়েটা পারেও বটে, সুমন লাগসই একটা উত্তর দেওয়ার আগেই আবার ভেসে আসে, "মন্দ হবে না কিন্তু, কি বল ?" অগত্যা উত্তরের খোঁজ ছেড়ে সুমনকেও যোগ দিতে হয় হাসিতে।

ঠিক সময়েই পৌঁছে যায় সুমন। তানিয়ারা একটু আগেই পৌঁছেছে। একটাই মুশকিল, তৃষা। মেয়েটা স্মার্ট, বুদ্ধিমতী। অথচ তার সাথে এত কথা কাটাকাটি হয়, ওফফো ! কিছুতেই মতে মিলবে না। এখানেই সুমনের

সপ্রতিভতা ঠিক কাজ করে না। তৃণার সাথে যত সহজে মিশে গেছিল অল্প কয়েকদিনের মধ্যে, অথচ এর সাথে এতদিনের পরেও তা দূর অস্ত। অবশ্য দেখাও তো হয় খুব কম। একটু অস্বস্তি বোধ করে সুমন। তানিয়াকে এসব বলে কোন লাভ হয় না, উল্টে গালাগাল খেতে হয়। ওর আবার খুব দোস্তি মেয়েটার সাথে। অগত্যা অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলে কফিশপে ঢুকে পড়ে সুমন। ঘন্টাখানেক আড্ডা দিয়ে উঠে পড়ে তিনজনে। তানিয়ার কিছু কেনাকাটা সেরে খেতে যাওয়া হবে একসাথে।

তানিয়া আজ বেশ খোশমেজাজেই বাড়ি ফিরল। একে তো লিস্টে নামটা দুই নম্বরে আছে। অবশ্য কোন কলেজে পাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তবু চাকরিটা তো হল। সবচেয়ে বড় কথা, এই দিনটার জন্য দুজনেই অপেক্ষা করে আছে সেই গতবার থেকে। সেবার এত পিছন দিকে নাম ছিল যে শেষ অব্দি শিকে ছেঁড়েনি। এবারেও না হলে ভীষণ মুশকিলে পড়ে যেত সে। বেচারাকে আর কতদিন ঝোলাত ! তাও সুমন বলেই কোন ঝামেলা করেনি, সেও শান্তিতে তৈরি হতে পেরেছে ইন্টারভিউয়ের জন্য। আজ তার স্বপ্নপুরণের দিন। ইতিমধ্যে একপ্রস্থ ফোনালাপ হয়ে গেছে দুই বাড়িতে। স্বভাবতই বাড়িতেও আনন্দের রেশ। তার মধ্যেই খানচার পাঁচ ফোন এল বন্ধুদের। শেষ অব্দি সুমনের ফোন অ্যাটেন্ড করে যখন খাবার টেবিলে এল, তখন প্রায় এগরোটা বাজে। শুতে শুতে সেই সাড়ে বারোটা। শুয়ে শুয়ে কত চিন্তা আসে তার। বন্ধুরা অলরেডি বিয়ের জন্য আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে দিয়েছে। ভাবলেই একরাশ আনন্দ ভিড় করে আসে মনে। কত জল্পনা কল্পনা করেছে এই দিনটাকে নিয়ে। এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে তানিয়া।

রাত কত হল জানা নেই। অন্ধকার ঘর। ঘুম ভেঙে যায় তানিয়ার। পাশের টেবিল থেকে বোতল তুলে জল খায় খানিকটা। পুরানো দিনগুলো ভিড় করে আসে। সুমনের সাথে প্রথম আলাপের দিনগুলো। মাসের মাসের পর মাস, বছর কেটে গেছে। এখন পিছন ফিরে তাকালে স্পষ্ট অথচ স্বপ্নময় মনে হয়। প্রথম প্রথম কি ঝগড়াটাই না হত !

অমিত মজুমদার।